ক্যালাহান থেকে কুলদীপ নায়ার

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

পঞ্চাশ বছর আগে সাংবাদিক ক্যালাহানের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার নবনির্বাচিত সরকারকে ধ্বংস করা। আর আজ সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার কি সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন, যাতে এই দেশে একটি সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের আন্দোলন জোরদার না হয় এবং সেই আন্দোলনের নেত্রী অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে আন্দোলনে নেতৃত্বদান থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হন? কুলদীপ নায়ার বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁর মুখ দিয়ে একটিও বিতর্কমূলক কথা বের করেননি। বরং খালেদা জিয়া ভারতের সঙ্গে প্রেম করার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উদ্বাহু এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। নায়ারের শঙ্খ বাজানোর জন্য বাংলাদেশেও তাঁর সমমনা মিত্রের এখন অভাব নেই

ভারতের প্রবীণ কলামিস্ট, এক সময়ের পলিটিকাল ডিপ্লোম্যাট কুলদীপ নায়ার সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত ২১ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পর দেশটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁদের বক্তব্য থেকে পরিস্থিতি আঁচ করার চেষ্টা করা। উদ্দেশ্যটি সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক সময় অনেক সাধু উদ্দেশ্যের পেছনে রহস্য থাকে। আমিও যখন শুনেছি, বাংলাদেশের একুশ-পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হওয়ার জন্য (এবং তা নিয়ে কলাম লেখার জন্য) ভারতের আর কোনো বিখ্যাত কলামিস্ট নন, আমাদের বহু পরিচিত কুলদীপ নায়ার ঢাকায় যাচ্ছেন, তখন তার পেছনে কোনো রহস্য আছে কিনা তা ভেবে একটু সন্দিহান হয়েছিলাম।

সহৃদয় পাঠকেরা আমার সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মনের জন্য ক্ষমা করবেন। ধোঁয়া দেখলে যেমন বুঝা যায়, তার নিচে আগুন থাকতে পারে, তেমনি সেই ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশের কোনো ব্যাপারে ভারতের খ্যাতনামা কলামিস্ট কুলদীপ নায়ারের আগ্রহ দেখলেই আমি সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ি। ভাবি, ধোঁয়ার নিচের আগুন না বেরিয়ে আসে। নায়ারের সঙ্গে আমার দু' তিনবার দেখা হয়েছে। দু'বারের সাক্ষাতের সময় কী ঘটেছিল তা স্পষ্ট মনে আছে। আমি নগণ্য লোক। আমার কথা বা আমার সঙ্গে কথাবার্তার কথা তার মনে নাও থাকতে পারে। প্রথম দেখা ১৯৭২ সালের শেষ দিকে নয়াদিল্লিতে এক ইংরেজি দৈনিকের অফিসে সংবর্ধনা পার্টিতে। আমি তখন ভারত সরকারের আমন্ত্রিত বাংলাদেশের তিনজন সম্পাদকের একজন হিসেবে দিল্লিতে ছিলাম। ভারতের খ্যাতনামা কলামিস্টদের মধ্যে কুলদীপ নায়ারের নামটি আমার কাছে বেশি পরিচিত ছিল এজন্য যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের যে রক্ষণশীল ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দিল্লির সাহায্যদানের ঘোর বিরোধী ছিল, কুলদীপ নায়ার ছিলেন সেই মহলটির চতুর মুখপাত্র। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যদি ইন্দিরা গান্ধীকে এই মহলটি প্রভাবিত করতে পারতো তাহলে যুদ্ধরত মুজিবনগর সরকারের ভাগ্যে কী ঘটতো তা এখন বলা মুশকিল নয়।

তবু কুলদীপ নায়ারের লেখাগুলো তখন দ্ব্যর্থবোধক ছিল। অর্থাৎ দু' রকম অর্থই করা যেতো। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জেল থেকে দেশে ফিরে সরকারের হাল ধরেন, তখন দিল্লিতে ইন্দিরা-বিরোধী রাজনৈতিক মহল বিশেষ করে কুলদীপ নায়ারের মতো একশ্রেণীর কলামিস্টের চাতুর্যের মুখোশ খুলে পড়ে। এরা খোলাখুলি মুজিব-সরকারের নানা খুঁত ধরতে শুরু করেন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তা গুরুতর ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে চলেছিল। মুজিব সরকার তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। কুলদীপ নায়ারেরা সদ্য স্বাধীন দেশটির একটি নতুন সরকারের সেই অসমসাহসী ও দুঃসাধ্য প্রচেষ্টাকে কিছুমাত্র দাম না দিয়ে তার মধ্যে নানা খুঁত ধরা, এমন কি ভারত-বিরোধিতা আবিষ্কারের কাজে রত হয়েছিলেন।

আমার কাছে সবচাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হয়েছিল কুলদীপ নায়ারের এ সময়ের অধিকাংশ লেখায় ঢাকার 'হলিডে' সাপ্তাহিকের সম্পাদক এনায়েতুল্লা খানের লেখা উদ্ধৃতি দেওয়া এবং নিজের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য সেগুলো ব্যবহার করা নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠেছিল। এনায়েতুল্লা খানও এ সময় অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব-সরকার সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছিলেন এবং ভারতের বাংলাদেশ-বিরোধী রাজনৈতিক মহলটি তা থেকে রসদ আহরণ করে তাদের প্রচারণায় কাজে লাগাচ্ছিলেন। এই কাজে সবচাইতে সামনের সারির কলামিস্ট ছিলেন কুলদীপ নায়ার।

১৯৭২ সালের শেষ দিকে আমি যখন দিল্লিতে যাই, তখন সেখানে পাকিস্তান-প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি ডানপন্থী, এমন কি কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল ও সংবাদপত্রও পাকিস্তান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোকে খুশি করার জন্য ব্যস্ত, দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে একটি বইয়ের ব্যাপক প্রচার দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম। বইটি পিলুমোদি নামে এক অখ্যাত ব্যক্তির লেখা। নাম 'মাই ফ্রেন্ড জুলফি।' লেখক দাবি করেছেন, বোম্বেতে স্কুল-কলেজ জীবনে পড়াশোনার সময় জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর সহপাঠী ছিলেন। আরও একটি ব্যাপার আমার তখন নজর এড়ায়নি। দিল্লির বুক স্টলগুলোতে ভুট্টো ও পাকিস্তানের সম্পর্কে অসংখ্য বইয়ের ছড়াছড়ি। কিন্তু যে দেশটি ভারতেরই সাহায্যে এক বছরেরও কম সময়ের আগে স্বাধীন হয়েছে, সেই দেশটি অথবা তার নেতা শেখ মুজিব সম্পর্কে একটি বইও কোনো বইয়ের দোকানে নেই। মুজিবের চাইতে ভুট্টোর গুরুত্ব তখন দিল্লিতে অনেক বেশি।

হিন্দুস্তান টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস প্রভৃতি ভারতের প্রভাবশালী কাগজগুলো এবং কুলদীপ নায়ারের মতো তাদের কোনো কোনো কলামিস্ট বাংলাদেশ ও শেখ মুজিব সম্পর্কে এমন সব কথা লিখতে শুরু করেছিলেন, যাতে মনে হতো উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে দেশটির এবং শেখ মুজিবের কোনো গুরুত্বই নেই। কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লার মতো বাংলাদেশের শেখ মুজিব ভারতের জন্য একজন দ্বিতীয় শেখ। এসব পত্রিকা ও কলামিস্ট ইন্দিরা গান্ধীকে পরামর্শ দিতে শুরু করলেন, পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের আর্থিক ও অন্যান্য পাওনা-গণ্ডা নিয়ে দিল্লি যেন ইসলামাবাদের উপর আর চাপ সৃষ্টি করতে না যায়; বরং ভুট্টো ও পাকিস্তানের মন জয় করার চেষ্টা করে। কারণ, গরিব বাংলাদেশের চাইতে সচ্ছল ও উন্নত পাকিস্তান হবে ভারতীয় পণ্যের জন্য অনেক বেশি লাভজনক মার্কেট। এই থিয়োরির প্রধান উগাতা ছিলেন কুলদীপ নায়ার।

ভারতের প্রভাবশালী ডানপন্থী কাগজগুলোর ইন্দিরা সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টির ফলেই পরবর্তীকালে ইন্দিরা-ভুট্টোর মধ্যে সিমলা সম্মেলন বাংলাদেশের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ লাভের প্রশ্নটি বৈঠকে আদৌ না তুলে বাংলাদেশে আটক ৯০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যকে বিনা বিচারে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ঢাকার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই স্বদেশ-প্রত্যাগত মওলানা ভাসানী সম্পর্কে ভারতের ডানপন্থী কাগজগুলোতে উস্কানিমূলক বিরূপ মন্তব্য করা হতে থাকে। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত শ্রী সুবিমল দত্ত এ জন্য ভারত সরকারের হয়ে মওলানা সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আর যায় কোথায়? এই পত্রিকাগুলো সুবিমল দত্তের উপর ক্ষিপ্ত প্রাণীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁর পদচ্যুতি অথবা অপসারণ দাবি করতে থাকে। এই ব্যাপারে কুলদীপ নায়ারের ইংরেজি লেখাটির শিরোনাম আমার মনে নেই। কিন্তু তাঁর লেখার সূত্র ধরে কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সুবিমল বাবুকে ধিক্কার জানিয়ে যে সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করে, তার শিরোনাম ছিল "ধিক নতজানু কূটনীতিক।"

১৯৭২ সালের শেষ দিকে দিল্লিতে কুলদীপ নায়ারের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই জেনে ফেলেছিলাম তিনি বাংলাদেশের হলিডে পত্রিকার এনায়েতুল্লা খানের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলেছেন এবং তাঁর লেখা থেকেই নিজের কলামের রসদ (বাংলাদেশ সম্পর্কে) জোগাড় করেন। বর্তমানে ঢাকায় তার প্রধান দুই মিত্র এনায়েতুল্লা খান মিন্টু এবং ডেইলি স্টারের মাহফুজ আনাম। সম্ভবত ইতিপূর্বে একবার ঢাকায় গিয়ে মাহফুজ আনামের বাড়িতেই নায়ার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭২ সালেই দিল্লির সাউথ ব্লকের নির্ভরশীল সূত্র থেকে আরও একটি খবর জেনেছিলাম যে, কুলদীপ নায়ার প্রচণ্ডভাবে কংগ্রেস ও ইন্দিরা-বিরোধী এবং পাকিস্তানের প্রতি দিল্লির সহানুভূতিশীল মহলটির সঙ্গে শুধু জড়িত নন, কলামিস্ট হিসেবে নিজেও পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হতেই তাই ক্ষুব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া কি আপনি ভারতের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন? দুই, বাংলাদেশ সম্পর্কে কলাম লেখার জন্য ঢাকার হলিডে পত্রিকার খবর অথবা তাঁর সম্পাদকের মতামত ছাড়া আপনার অন্য কোনো সূত্র অথবা নিজস্ব মতামত কি নেই? আমার প্রশ্নে নায়ার রেগে গিয়েছিলেন। দু'জনের মধ্যে উত্তপ্ত তর্ক হয়েছিল এবং এই

তর্কাতর্কির এক সময়ে নায়ার বলে উঠেছিলেন, তিনি ভারতের ইন্দিরা অথবা বাংলাদেশের মুজিবের প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করেন না এবং তিনি সেক্যুলার ও ডেমোক্রাটিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

তাঁর কথায় আমার খুব একটা প্রত্যয় হয়নি। নায়ার-চরিত্র সম্পর্কে আমার অনুমান যে ভ্রান্ত নয়, তার প্রমাণ পেলাম ভারতে ইন্দিরা সরকারের পতনের পর। তিনি দিল্লির অকংগ্রেসী সরকারের দ্বারা তাঁর দীর্ঘকালের ইন্দিরা-বিরোধী সূক্ষ্ম প্রচারণার জন্য পুরস্কৃত হন এবং লন্ডনে তাঁকে হাইকমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়। এই সময় লন্ডনের ভারতীয় বিদ্যাভবনের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। তিনি এতদিনে দিল্লিতে আমার সঙ্গে দেখা হওয়া এবং কথাবার্তা হওয়ার কথা সম্ভবতঃ ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে আমি বাংলাদেশের একজন কলামিস্ট এ কথা জেনে সাদরে আমার করমর্দন করলেন এবং জিগ্যেস করলেন, তাঁর বন্ধু এনায়েতুল্লা খান কেমন আছেন? আমি জবাব দিয়েছি। একমাত্র মুজিব সরকার ছাড়া আর সব সরকারের আমলেই এনায়েতুল্লা ভালো ছিলেন এবং এখনো ভালো আছেন। তিনি আমার তির্যক জবাবে একটু হতভম্ব হয়েছিলেন। তাঁকে জিগ্যেস করেছি, বহু আগে দিল্লিতে আমাকে বলেছিলেন, আপনি সেক্যুলার এবং ডেমোক্রাটিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাহলে এখন যে সরকারের প্রতিনিধি হয়ে লন্ডনে এসেছেন, সে সরকার কি সর্বতোভাবে সেক্যুলার? তিনি আমার কথার জবাব দেননি।

সেই কুলদীপ নায়ার আবার ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় গিয়ে চায়ের কাপে তুফান সৃষ্টি করেছেন। শেখ হাসিনার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার জন্য বাংলাদেশের আর্মি দায়ী।" হাসিনা এ কথা বলেছেন কি বলেননি এ আলোচনায় যাওয়ার আগে আওয়ামী লীগ-নেত্রীর চারপাশে যে প্রেসসংক্রান্ত উপদেষ্টারা আছেন, তাঁদের অজ্ঞতা ও অসতর্কতাকে ধিক্কার জানাব। আমি যদি এ সময় ঢাকায় থাকতাম তাহলে তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় পরামর্শ দিতাম, তিনি যেন কুলদীপ নায়ারকে কোনো অনির্ধারিত এবং খোলামেলা সাক্ষাৎকার না দেন। ১৯৭৩ সালের গোড়ায় ভারতের এক মুখচেনা সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কলকাতা থেকে ঢাকায় ছুটে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর তখনকার গণসংযোগ অফিসার তোয়াব খানের (বর্তমানে জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক) দৃঢ় অসম্মতির দরুন বঙ্গবন্ধু তাঁকে সাক্ষাতদান করেননি।

তাহলে হাসিনা কেন কুলদীপ নায়ারের ট্রাপে পা দিতে গেলেন? এই সাক্ষাৎকারের মাত্র ১৭ দিন আগে যাঁর প্রাণ অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছে এবং এখনও যিনি চিকিৎসাধীন, সেই নেত্রী কিভাবে সম্পূর্ণ অসতর্কভাবে কুলদীপ নায়ারের মতো এক চিহ্নিত ভারতীয় সাংবাদিককে সাক্ষাতদান করেন এবং তাঁর সঙ্গে খোলামেলাভাবে এমন সব কথাবার্তা বলেন, যা অনায়াসে টুয়িস্ট করা চলে? হাসিনা এই সাক্ষাৎকারে কি বলেছেন এবং তা কতোটা টুয়িস্ট করা হয়েছে তা আমি অনুমান করতে পারি। কিন্তু এতো বড় দুর্ঘটনার পর পরই, যখন বাংলাদেশের জোট সরকার মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে এর দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে, তখন তিনি কেন কুলদীপ নায়ারের মতো সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন, তা আমার অনুমানের বাইরে।

হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে নায়ার সাহেবের যে কলামটি বের হয়েছে তার শিরোনাম Blame game is on (দোষারোপের খেলা চলছে)। লেখাটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, এই লেখার শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল– My own game is on (আমার নিজের খেলা চলছে)। তার সূক্ষ্ম চালাকিটাও হঠাৎ চোখে পড়ার মতো নয়। শেখ হাসিনার সঙ্গে কুলদীপ নায়ারের সাক্ষাতের পূর্বনির্ধারিত তারিখ ছিল ৮ সেপ্টেম্বর বুধবার। তিনি আকস্মিকভাবে আগের দিন ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারে সুধা সদনে গিয়ে হাজির হন। হাসিনার সহকারীরা বিস্মিত হয়ে তাঁকে জানাল, তাঁর তো আজ আসার কথা নয়। আগে আসার কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ নায়ার দেখাতে পারেননি। তবু হাসিনা যখন শুনেছেন, এই বয়োবৃদ্ধ ভারতীয় সাংবাদিক এসে পড়েছেন, তখন তিনি সহকারীদের বলেছেন, 'বুড়ো মানুষ এসে পড়েছেন। তাঁকে আসতে দাও।' হাসিনা তখন নিশ্চয়ই জানতেন না, এই বুড়ো সাংবাদিকের জামার আস্তিনের নিচে কলম নয়, শিবাজির বাঘনখ লুকানো রয়েছে।

ঢাকার হাওয়া থেকে পাওয়া খবরে আমি জেনেছি, শেখ হাসিনার আগে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে নায়ারের দেখা হওয়ার দিনক্ষণ নির্ধারিত ছিল। একটি অদৃশ্য মহল নাকি তাঁকে অনুরোধ জানায়, তিনি যেন আগে হাসিনার কাছে যান এবং হাসিনা কী বলেন তা তাঁদের অবহিত করেন। তাহলে প্রধানমন্ত্রীও তাঁর জবাব তৈরি করার সুযোগ পাবেন। কুলদীপ নায়ার সেই আজ্ঞা নতমস্তকে পালন করেছেন এবং শেখ হাসিনার সরলতা ও ঔদার্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন সুধা সদনে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ফলে খালেদা জিয়া আগেভাগেই হাসিনার বক্তব্য (যার কিছু অংশ নায়ার কর্তৃক টুয়িস্ট করা) জেনে নিয়ে নিজের পছন্দমতো জবাবগুলো সাজিয়ে গুজিয়ে নায়ারকে উপহার দিতে পেরেছেন অথবা নায়ারই সেগুলো সাজিয়ে গুজিয়ে নিজের কলামে ব্যবহার করে হাসিনাকে বিতর্কে জড়াতে এবং খালেদাকে সকল সন্দেহের উর্ধে রাখার চেষ্টা করতে পেরেছেন এবং সেই সঙ্গে এমন একটা ভাব দেখাতে পেরেছেন যে, তিনি নিরপেক্ষভাবে কলামটি লিখেছেন। ঢাকার 'নিরপেক্ষ' দুই সম্পাদকইতো তার বন্ধু!

আরও একটি ব্যাপার এখানে লক্ষ্য করার মতো। কুলদীপ নায়ারের 'ব্লেম গেম ইজ অন' শীর্ষক লেখাটি প্রথমে ছাপা হয়েছে পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক 'ডন' পত্রিকায়। তারপর ছাপা হয়েছে ঢাকার ইংরেজি 'ডেইলি স্টার' ও বাংলা দৈনিক 'প্রথম আলো'তে। লেখাটি কি একই সঙ্গে 'ডন' ও 'ডেইলি স্টারে' পাঠানো হয়েছে, না 'ডেইলি স্টারে' লেখাটি পুনর্মুদ্রণ? এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যেও এই কলামটি লেখার নেপথ্যের রহস্য কিছুটা লুকানো রয়েছে। এই কলামে যে ইচ্ছাকৃতভাবে হাসিনাকে একটি বিপজ্জনক বিতর্কে জড়ানোর এবং খালেদা জিয়াকে সন্দেহমুক্ত করে ভারত-বন্ধু সাজাবার (১৪ ও ১৫ আগস্টে ভারত ও পাকিস্তানের ওয়াগা বর্ডারে দুই দেশের মৈত্রীর মঙ্গলদীপ জ্বালানোর মতো ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও খালেদা অনুরূপ মঙ্গলদীপ জ্বালাতে চান বলে নায়ারের বর্ণনা এবং ডেইলি স্টারে তা খুবই গুরুত্ব দিয়ে ছাপানো) চেষ্টাটি করা হয়েছে তা যে কোনো সচেতন পাঠকের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

মজার ব্যাপার, পাকিস্তানের ডন এবং বাংলাদেশের ডেইলি স্টার পত্রিকায় নায়ারের লেখার যে ভার্সন ছাপা হয়েছে, 'প্রথম আলো' পত্রিকায় তার তরজমা ছাপা হওয়ার সময় ভার্সনটি বদলে গেছে অথবা বদলানো হয়েছে। হাসিনার কথিত বক্তব্যটি ডন ও ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়েছে একভাবে এবং প্রথম আলো পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে অন্যভাবে। ডন ও ডেইলি স্টার পত্রিকায় ছাপানো কুলদীপ নায়ারের কলামে বলা হয়েছে, "Hasina, whom I met first, had no doubt that it was the job of the army which she alleged was against the liberation of Bangladesh." [হাসিনা, যার সঙ্গে আমি প্রথম দেখা করি, তার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই কাজটি (২১ আগস্টের হামলা) আর্মি করেছে। হাসিনার অভিযোগ এই আর্মি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল।]

'প্রথম আলো'তে এই লেখাটির তরজমা বেরিয়েছে অন্যভাবে। "বাংলাদেশে দোষারোপের খেলা" এই শিরোনামে নায়ারের লেখাটির তরজমায় বলা হয়েছে, "আমি প্রথমে সাক্ষাৎ করি শেখ হাসিনার সঙ্গে। তিনি আমাকে যেসব কথাবার্তা বলেন, তাতে আমার মনে হয়েছে, তার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, কাজটা ছিল সেনাবাহিনীর একটা অংশের; যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল।" সহৃদয় পাঠকেরা এখন নায়ারের ইংরেজি ভার্সন ও তার বাংলা অনুবাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্যটা লক্ষ্য করুন। নায়ারের মূল ইংরেজির বক্তব্য যদি সত্য হয়, তাহলে একুশের ঘটনার জন্য হাসিনা গোটা আর্মিকে দায়ী করেছেন এবং বলেছেন, তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী ছিল। আর বাংলা তরজমার বক্তব্য সত্য হলে, হাসিনা হামলার জন্য আর্মির একটা অংশকে দায়ী করেছেন, যারা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল। এ বক্তব্য সত্য হলে হাসিনা বর্তমান আর্মিকে নয়, একাত্তর সালে আর্মির যে অংশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল, তাদেরই বর্তমান ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন। এই বক্তব্য নিয়ে হাসিনাকে কোনো বিতর্কে জড়ানো যায় না। আর্মির একটা অংশ তো মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা, বঙ্গবন্ধু-হত্যা, চার জাতীয় নেতা-হত্যা, কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেওয়া, জিয়া-হত্যা, দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তন ইত্যাদি বহু ঘটনার জন্য দায়ী। সে কথা কে অস্বীকার করবে?

এখন প্রশ্ন, নায়ারের মূল ইংরেজি ভার্সনটি বাংলা তরজমায় পরিবর্তিত হলো কেন অথবা কেন করা হলো? বাংলা তরজমায় কি সজ্ঞানেই নায়ারের আসল অপচেষ্টাটি ঢাকা দেওয়ার জন্য কোনো পরিপক্ব মাথা এই পরিবর্তনটি ঘটিয়েছেন, যা ঘটানোর মতো পরিপক্ব মাথা ডেইলি স্টারে নেই? স্টার নায়ারের মূল বক্তব্যটিই অপরিবর্তিত অবস্থায় ছেপে দিয়েছে। কুলদীপ নায়ারের লেখা এই মূল ইংরেজি নিবন্ধটি পড়লে আমার মতো অনেকেরই মনে পড়তে পারে যে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৫৪ সালে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা ক্যালাহান সাহেব হঠাৎ সুদূর নিউইয়র্ক থেকে এই উপমহাদেশে উড়ে এসেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হকের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। ফজলুল হক তখন তাঁর হাঁটুর ব্যথার চিকিৎসার জন্য কলকাতায় ছিলেন। ক্যালাহান সেখানে গিয়ে তাঁকে ধরলেন। তারপর নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বড় করে খবর ছাপা হয়েছিল, ফজলুল

হক কলকাতায় বসে বলেছেন, তিনি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে (Political division) বিশ্বাস করেন না। ফজলুল হক ঢাকায় ফিরে খবরটির প্রতিবাদ করলেন। বললেন, তিনি কথাটা এভাবে বলেননি। কিন্তু কে শোনে কার কথা? পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার এবং তাদের সমর্থক সংবাদপত্রে তা কোনো গুরুত্ব পায়নি। ফজলুল হকের মাথায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগ চাপিয়ে পদচ্যুত ও গৃহবন্দী করা হয়।

পঞ্চাশ বছর আগে ফজলুল হককে সাবধান করেছিলেন তাঁর এক বয়োবৃদ্ধ সাংবাদিক বন্ধু। বলেছিলেন, ফজলুল হক, তুমি কোনো মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে এখন কথা কয়ো না। সিআইএ'র বহু এজেন্ট সাংবাদিকের বেশে উপমহাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ পঞ্চাশ বছর পর কুলদীপ নায়ার কলামিস্টের বেশে কাদের এজেন্ট হয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন তা আমি জানি না। পঞ্চাশ বছর আগে সাংবাদিক ক্যালাহানের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার নবনির্বাচিত সরকারকে ধ্বংস করা। আর আজ সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার কি সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন, যাতে এই দেশে একটি সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের আন্দোলন জোরদার না হয় এবং সেই আন্দোলনের নেত্রী অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে আন্দোলনে নেতৃত্বদান থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হন? কুলদীপ নায়ার বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁর মুখ দিয়ে একটিও বিতর্কমূলক কথা বের করেননি। বরং খালেদা জিয়া ভারতের সঙ্গে প্রেম করার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উদ্বাহু এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। নায়ারের শঙ্খ বাজানোর জন্য বাংলাদেশেও তাঁর সমমনা মিত্রের এখন অভাব নেই। (অসমাপ্ত)

লন্ডন ॥ ২৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ॥ ২০০৪

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ॥ যে প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন

জেনারেল (অব) **এম মোস্তাফিজুর রহমান,** বি.বি.

গত ২১ আগস্ট বিকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটায় ঢাকার ২৩ নং বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে একদল আক্রমণকারী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এমপি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম ও কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যদের ওপর গ্রেনেড হামলা চালায়। শুধু তাই নয়, মার্কসম্যানরা তাঁদের ওপর গুলিও বর্ষণ করে। হামলার পর সেনাবাহিনীর একটি যান তড়িঘড়ি করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। অকুস্থলে আর্জেস গ্রেনেড পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য সন্ত্রাসবাদীরা বা হামলাকারীরা এর আগে কখনও এ জাতীয় গ্রেনেড ব্যবহার করেনি। ২০০০ সালে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে কিংবা গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায়ও এ ধরনের গ্রেনেড ব্যবহৃত হয়নি। যশোর শহরের উদীচীর অনুষ্ঠানে হামলায় যে গ্রেনেড ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলোর টুকরোগুলো পরে উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে কোটালীপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভাস্থলের কাছাকাছি দুই জায়গায় দু'টি অবিস্ফোরিত বোমাও পাওয়া গিয়েছিল। একটি পাওয়া গিয়েছিল জনসভার আগে। অন্যটি পরে। স্বভাবতই এ দু'টি বোমার টার্গেট ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদীচী হামলায় ব্যবহৃত এইচই-৩৬ টাইপের গ্রেনেড এবং কোটালীপাড়ায় জনসভার কাছাকাছি পেতে রাখা স্থানীয়ভাবে বানানো ৮০ ও ৭৬ কেজি ওজনের দু'টি বড় ধরনের বোমা (অখঊ) সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রেকর্ড যশোর সেনানিবাসে এবং ঢাকার আর্মি হেডকোয়ার্টারের মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেট (MO Dte) -এ রক্ষিত আছে। তখন যেসব বিস্ফোরক ও বোমা পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো ১৯৮১ সালের শেষদিক থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত সামরিক প্যাটার্নের আর্জেস গ্রেনেড ছিল না।

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তার দু'পাশের ভবনের ছাদ থেকে দুই ডজন আর্জেস গ্রেনেড ছোড়া হয়েছিল। অকুস্থল থেকে যে চারটি গ্রেনেড অবিস্ফোরিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে দু'টি ছিল প্রাইমড্ এবং দু'টি মিস্‌ফায়ার্ড। সেনাবাহিনী সদর দফতরের এখন ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন :

১. যে জায়গায় জনসভা হচ্ছিল সেখানে সেনাবাহিনীর যান কেন গিয়েছিল? নির্ধারিত জনসভাস্থল, সম্ভাব্য গোলযোগের স্থান, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, নিউমার্কেট ইত্যাদি স্থানে সামরিক যান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সেনাবাহিনী সদর দফতরের মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেটের (MO Dte) পরিষ্কার নির্দেশ জারি আছে। আওয়ামী লীগের জনসভাস্থলে পাঠানো যানটি বৈধ দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিল কিনা তা দেখার জন্য সেনাবাহিনী কি কোন তদন্ত চালিয়েছে? সামরিক যানটিতে কারা ছিল? ঐ যানে কি কোন দায়িত্বশীল অফিসার বা জেসিও/এনসিও ছিল? এ সংক্রান্ত তদন্ত রিপোর্ট কি প্রকাশ করা সম্ভব?

২. আর্জেস গ্রেনেড এর আগে সন্ত্রাসবাদী বা দুষ্কৃতকারীদের হাতে দেখা যায়নি। ১৯৮১ সালের শেষদিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভিনটেজ টাইপ এইচই-৩৬-এর পরিবর্তে এসব গ্রেনেড চালু করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পর্যায়ক্রমে আর্জেস গ্রেনেড তৈরির জন্য নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি রাজেন্দ্রপুর/গাজীপুর ক্যান্টনমেন্টে একটি পরীক্ষামূলক কারখানাও স্থাপন করে। সেনাবাহিনী প্রধান কি এই মর্মে কোন অভ্যন্তরীণ তদন্ত চালিয়েছেন যে তাঁর জানার বাইরে কোন কিছু ঘটেনি? যদি তিনি তা না করে থাকেন তবে অতিসত্বর সেটা তাঁর করা প্রয়োজন।

৩. সেনাবাহিনীর এ রকম অন্তত ৫ লাখ আর্জেস গ্রেনেড বাংলাদেশের সকল ক্যান্টনমেন্টের গোলাবারুদের গুদামে রয়ে গেছে। অশুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তিদের হাত দিয়ে এমন দুই ডজন গ্রেনেডের বাক্স সেনাবাহিনীর অস্ত্রাগার থেকে বাইরে পাচার হয়ে যাওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব কিছু নয়। সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা কি ফিল্ড পর্যায় পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা যাচাই করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন?

সেনাবাহিনী সদর দফতর কি তাদের হাতে যেসব গ্রেনেড আছে সেগুলোর সঙ্গে ২১ আগস্টের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার পাওয়া অবিস্ফোরিত ও মিসফায়ার্ড গ্রেনেডগুলোর ব্যাচ ও লট নম্বর মিলিয়ে দেখেছে? যদি দেখে থাকে সে বিষয়টি কি তাদের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব? সকল গ্যারিসনের এ সংক্রান্ত সোর্স ও গোয়েন্দা রিপোর্ট কি? এ ধরনের জাতীয় সঙ্কট ও ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে কোনকিছুই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয়া উচিত নয়।

৪. কী ও লিভার আর্মযুক্ত প্রাইমড্ গ্রেনেড সকল সময়ই নিরাপদ যদি না কী টেনে বের করা এবং লিভার মুক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট কিছু সময় অতিক্রান্ত হবার পর অবিস্ফোরিত গ্রেনেডও নিরাপদ। ঘটনার দিন রাতের বেলায়ই সেনাবাহিনীর এক্সপ্লোসিভ অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল (EOD) বিশেষজ্ঞরা এবং বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দলগুলো তড়িঘড়ি করে গ্রেনেডগুলো ধ্বংস করে ফেলেছিল। কার নির্দেশে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দলগুলো সেখানে গিয়েছিল? কাজ সম্পন্ন করার পর তাঁরা কার কাছে রিপোর্ট দিয়েছিল? গোটা বাংলাদেশে এ ধরনের বোমা/বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণের কাজটা সেনাপ্রধানের পূর্ব অনুমতিক্রমে সেনা সদর দফতরের মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেটের (MO Dte) নির্দেশে করা হয়ে থাকে। সেনা সদর দফতর কি গ্রেনেড ধ্বংসের কাজটা অনুমোদন করেছিল? করলে কার নির্দেশে করেছিল? এ সংক্রান্ত নির্দেশ বা অনুরোধ যদি পুলিশ সদর দফতর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এসে থাকে তাহলে কে সেই নির্দেশ বা অনুরোধ করেছিল? সেই নির্দেশ বা অনুরোধ কি মৌখিক ছিল, না লিখিত ছিল? ইওডি/বোমা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা দ্রুত গ্রেনেড ধ্বংসের ব্যবস্থা করে প্রশাসন কেন আর্জেস গ্রেনেডের মৌলিক ক্লুগুলো নষ্ট করে ফেলেছিল? মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেট (MO Dte) সরকারকে কি পরামর্শ দিয়েছিল? সেনাবাহিনী সদর দফতর ও সেনাপ্রধানের তরফ থেকে এসব মৌলিক প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। কান টানলে মাথা আসে। টেনেই দেখুন না সেনাপ্রধান, মাথা আসে কিনা?

৫. সরকারের সকল সংস্থা, প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর মালিকানাধীন দেশের সমস্ত স্থলভিত্তিক অস্ত্র ও গোলাবারুদের হেফাজতকারী হচ্ছে আর্মি হেডকোয়ার্টারের মাস্টার জেনারেল অব অর্ডন্যান্স (MGO)। ঘোষিত পদ্ধতি অনুযায়ী আর্মি হেডকোয়ার্টারের এমজিও শাখাকে না জানিয়ে এসব অস্ত্র আমদানি করা বা চালু করা যায় না। সেনাপ্রধান বা এমজিও কি অকুস্থলে প্রাপ্ত বুলেট খোসাগুলো সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছিলেন? মার্কসম্যানদের ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ক্যালিবার কি ছিল? আমাদের স্পেশাল ফোর্সের ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ক্যালিবারের সঙ্গে কি তার মিল আছে? সামরিক বাহিনীর শীর্ষ অফিসাররা কি চাকরিরত কিংবা সাম্প্রতিককালে অবসরগ্রহণকারী বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার ও জোয়ানদের অনুপুঙ্খ যাচাই করে দেখেছেন?

৬. ২১ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে ঐ দিন সন্ধ্যায় সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী এবং আর্মি সিকিউরিটি ইউনিটের (ইওখ) সেনাপ্রধানকে ব্রিফিং দেয়ার কথা। তারা তাঁকে কি কি বলেছিল সেনাপ্রধান কি তা স্মরণ করে বলতে পারেন? পরের দিন ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর

পদস্থ সেনা অফিসাররা নিশ্চয়ই এ ঘটনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের অভিমত কি ছিল? তাঁরা কি কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন?

দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী দেশে ও বিদেশে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা অর্জন করেছে। এই মর্যাদার অবমাননা করা উচিত নয়। কিন্তু একই সেনাবাহিনীর দুরভিসন্ধিমূলক বা বিপথগামী সদস্যরা অতীতে আমাদের দুই দুইজন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করেছে-- সে কথাও আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ রাখতে হবে। দায়মুক্তির ব্যাপারটি হয়ত অতীতের ব্যাপার। এই ভাবমূর্তিকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। সেই ভাবমূর্তি শুধু পুনর্প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভব। জনগণের প্রতিনিধিরা, তথা রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন চাইবে তখন সেনাবাহিনী দেশী-বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে গণতন্ত্র ও প্রগতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য রাজনীতিবিদদের আজ্ঞানুবর্তী হওয়া--তাদের দোষারূপ করা নয়। সেনাবাহিনী ও দেশের স্বার্থে সেনাপ্রধানের আত্মানুসন্ধান করা প্রয়োজন। আজ যিনি বিরোধী দলের নেতা বা নেত্রী কাল তিনিই হয়ত হবেন সরকারপ্রধান। সেনাপ্রধানকে ভয়ভীতি বা আনুকূল্যের উর্ধে উঠে একজন সক্রিয় সেনা অধিনায়ক হতে হবে। তাঁকে সাহসী কিছু করার, ইতিবাচক চিন্তা করার এবং জাতির কাছে ব্যাখ্যা দেয়ার মতো হিম্মত থাকতে হবে।

সেনাবাহিনী প্রতিবাদ করে না, পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেয় মাত্র। অনুগ্রহ করে এই লেখাটিকে দুর্ভাগ্যজনক, অযাচিত, বিদ্বেষপ্রসূত ও দেশপ্রেম বিবর্জিত বলে আখ্যায়িত করবেন না। আসল সময়েই দেশপ্রেমের পরীক্ষা হয়ে গেছে। আরেক আগস্ট ট্র্যাজেডির রহস্য মোচনের জন্য মনমানসিকতাকে উজ্জীবিত করাই হবে একান্ত সঠিক ও যথার্থ কাজ।

নারী বন্দীদের নগ্ন করে প্যারেড করানো হতো অত্যাচার, ধর্ষণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক

এনামুল হক

(শেষাংশ)

আয়াদের লাশ সরিয়ে নেয়ার পর আলাজাবি ও আরও ১৮ ইরাকী বন্দীকে সামরিক কম্পাউন্ডের ভিতর একটি মিনিবাসে তোলা হয়। আমেরিকানরা তাদের জানায়, "আজ রাতে তোমাদের কাউকে ঘুমুতে দেয়া হবে না।" যেমন কথা তেমন কাজ। সারা রাত ওরা তখনও মিউজিক বিরামহীনভাবে জোরে জোরে বাজিয়ে শোনাতে লাগল। কেউ ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দরজায় দমাদম আঘাত করে তাঁর ঘুম ছুটিয়ে দিতে লাগল। সেদিন ছিল বড়দিন। বন্দীদের সেখানে ওরা তিনদিন আটকে রেখেছিল। মার্কিন সৈন্যদের অনেকেই ছিল মাতাল। অবশেষে একদিন এক মার্কিন রক্ষী আলাজাবির কাঁধ ভেঙ্গে ফেলার পর বাদবাকি জীবিত ভাইবোনসহ তাঁকে প্রথমে বাগদাদের পুলিশ একাডেমীতে এবং তারপর এ বছরের ৪ জানুয়ারি আবু গরিব কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তী ১৫৬ দিন নির্জনাবাসে দিন কাটে তাঁর। আরও পাঁচ ইরাকী মহিলাসহ তাঁকে আবু গরিবের কুখ্যাত 'হার্ড সাইটে' আটক রাখা হয়। কারাগারের এই অংশে ইরাকী বন্দীদের ওপর মার্কিন প্রহরীদের যৌন নির্যাতন ও হয়রানির ছবি দু'মাস আগে ছাপা হয়েছিল। মহিলাদের এখানকার উপরতলার সেল ব্লকে রাখা হয়। আর যেসব পুরুষ বন্দীকে বাগে আনা যাচ্ছে না তাদের রাখা হয় নিচতলায়। বন্দীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ থাকত বেশ কয়েকটি খোলা তাঁবুর মধ্যে। তাঁবুর চারপাশ ধারালো তার দিয়ে ঘেরা। চারকোণে মার্কিন রক্ষীদের উঁচু পোস্ট। মার্কিন সামরিক বাহিনী এখানকার বন্দী নির্যাতনের ঘটনার তদন্ত শুরু করার আগে আবু গরিব বন্দী শিবিরে আলাজাবির বন্দী জীবনের প্রথম কয়েকটি সপ্তাহ অত্যাচার-নির্যাতন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অত্যাচার চালাতে প্রহরীরা বন্য কুকুরও ব্যবহার করত। আদিল নামে ১৪ বছরের এক ছেলের দিকে বন্য কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল এক মার্কিন প্রহরী। কুকুরটি ছেলেটার পা কামড়ে ধরে। অন্য প্রহরীরা প্রায়ই বন্দীদের মারধর করত। প্রহারের চোটে তাদের নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ত। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারির প্রচণ্ড শীতে বন্দীদের ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করতে বাধ্য করা হতো। শুরু থেকে মানসিক ও শারীরিক দু'ধরনের নির্যাতন চলত বন্দীদের ওপর। আলাজাবি এসব নির্যাতনের ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর এক মেয়ে আছে ২০ বছরের, নাম ফারাহ। আর আছে সাফাত নামে ৪ বছরের এক নাতনি।

আবু গরিব কারাগারে সে সময় মার্কিন সৈন্যদের হাতে নিজে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা সে কথা অবশ্য বলেননি আলাজাবি। তবে মার্কিন সামরিক বাহিনীর তদন্ত রিপোর্টে ধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কারাগার থেকে বাইরে পাচার করা নূর নামে এক মহিলার চিঠিতে ধর্ষণের যে অভিযোগ করা হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়। ১৪ বছরের এক ইরাকী মেয়েকে মার্কিন প্রহরীরা বার বার বলাৎকার করেছে এমন অভিযোগ একাধিক বন্দীর কাছে শোনা গেছে। আরও জানা গেছে যে, প্রহরীরা বেশকিছু মহিলা বন্দীকে পুরুষ বন্দীদের সামনে নগ্ন হয়ে প্যারেড করতে বাধ্য করত।

আলাজাবিকে আটক রাখা হতো দুই মিটার লম্বা ও দুই মিটার চওড়া একটা সেলে। প্রথমদিকে কোন বিছানা দেয়া হতো না। শুধু টয়লেট করার জন্য একটা বালতি থাকত। তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল কোন কথা বলা চলবে না। প্রথম তিন সপ্তাহ তিনি তাই সম্পূর্ণ বোবা হয়েছিলেন। মার্কিন প্রহরীদের কাছে অনেক চেয়েচিন্তে তিনি একটা কোরান শরিফ পেয়েছিলেন। কেমন করে একটা পেনও যোগাড় করেছিলেন। ও দিয়ে তিনি কোরানের মার্জিনে তাঁর ওপর অত্যাচার-লাঞ্ছনার বিবরণ দিন-তারিখসহ লিখে রাখতেন। বন্দীদশার প্রথম কয়েক মাস মার্কিন সৈন্যরা তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ও খামখেয়ালী আচরণ করেছিল।

আলাজাবি কিছু কিছু ইংরেজী বলতে পারতেন বলে তাঁকে আবর্জনা সাফ করার কাজ দেয়া হয়েছিল। কখনও তাদের পর্যাপ্ত খাবার জুটত না। ক্ষুধার জ্বালায় একদিন এক বৃদ্ধাকে তিনি তাঁর চোখের সামনে মূর্ছা যেতে দেখেন। আমেরিকানদের খাবারের কোন অভাব ছিল না। যেমন খেত তেমনি নষ্টও করত। তথাপি বন্দীদের ক্ষিদে মিটানোর মতো খাবার দিত না। আলাজাবি আবর্জনার পাত্রে পড়ে থাকা একটা প্যাকেটের মধ্যে কিছু খাবার পেয়ে সেই বৃদ্ধাকে খেতে দেন। মার্কিন সৈন্যরা তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে শাস্তি হিসাবে এক মিটার লম্বা ও এক মিটার চওড়া একটা সেলের ভিতর ঢুকিয়ে উপর থেকে তাঁর ওপর চার ঘণ্টা ধরে ঠাণ্ডা পানি ঢালতে থাকে। কোরানের মার্জিনে তিনি ঘটনার তারিখটা লিখে রেখেছেন ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪।

প্রথম চারটি মাস আলাজাবিকে কারাগারের ঐ ব্লক থেকে বেরুতে দেয়া হতো না। এ সময় মাঝেমধ্যে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। প্রায়ই জানতে চাওয়া হতো তিনি ইরাকী প্রতিরোধ বাহিনীতে ছিলেন কিনা। কখনও মার্কিন সৈন্যদের দিকে রকেট ছুড়ে ছিলেন কিনা। প্রশ্নটা তাঁকে এত ঘন ঘন করা হতো যে অন্য মহিলারা ঠাট্টা করে তাঁর নাম দিয়েছিল কুইন অব আরপিজি (রকেট প্রফেলড্ গ্রেনেড)। গত এপ্রিলে আবু গরিব কারাগারের কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে পড়ার পর আলাজাবিকে দিনে ১০ মিনিট বাইরের আঙ্গিনায় ব্যায়াম করার সুযোগ দেয়া হয়। একটা বিছানাও জোটে তাঁর ভাগ্যে। মিসেস পামার নামে এক নতুন মহিলা প্রহরী নিয়োগ করা হয় আলাজাবি ও অন্যান্য মহিলার জন্য। মিসেস পামার তাঁদের ইংরেজী শিখাতেন এবং বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে আরবী শিখতেন। আবু গরিব কারাগার কেলেঙ্কারি ফাঁস হবার পর গত মে মাসের কোন একদিন মেজর জেনারেল জিওফ্রে মিলার বিকালে একদল সাংবাদিক নিয়ে কারা পরিদর্শনে আসেন। আগের রাতে মার্কিন প্রহরীরা সেই কুখ্যাত সেল ব্লক থেকে সকল কিশোর ও পুরুষ বন্দীকে সরিয়ে নিয়ে শুধু আলাজাবি ও গুটিকয়েক মহিলা বন্দীকে উপরতলায় রাখে। মিসেস পামার তাঁদের শিখায় যে, জেনারেলের কারা পরিদর্শনের সময় তাঁদেরকে চুপ করে নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। তার কথামতো চললে তাঁদেরকে আরও বেশি সময় সেলের বাইরে রোদের মধ্যে কাটাতে দেয়া হবে। পরদিন জেনারেল মিলার বিরাট একদল সাংবাদিক নিয়ে এলেন। আলাজাবি শুনতে পেলেন জেনারেল মিলার সাংবাদিকদের বলছেন, এখানে যাদের রাখা হয়েছে তাদের কেউ কেউ খুনী। শুনে আলাজাবি চিৎকার করে বলে উঠলেন : "আমরা খুনী নই। তোমরা খুনী। এ দেশ আমাদের। তোমরাই এ দেশে হামলা চালিয়েছ।" এ ঘটনার পর তারা গোটা একমাস আলাজাবিকে তাঁর সেল থেকে বেরুতে দেয়নি। এক আমেরিকান অফিসার এসে আলাজাবিকে বলে, "তোমাদের জন্য আমাদের সবাইকে সাজা ভোগ করতে হয়েছে।"

জেনারেল মিলারের আবু গরিব কারাগার পরিদর্শনের পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ মার্কিনীরা কারাগার থেকে বেশ কয়েক শ' বন্দীকে মুক্তি দিতে শুরু করে। আলাজাবি ও তাঁর বোনকে সেল থেকে তাঁবুতে সরিয়ে নেয়া হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মহিলা বন্দীর সঙ্গে তাঁদেরকেও মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি পাওয়ার পর আলাজাবির কোটিপতি স্বামী তাঁকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

আলাজাবি বেশ কয়েক মাস মার্কিন সৈন্যদের হেফাজতে ছিলেন এই তাঁর অপরাধ। তাঁর দুই ভাই এখনও কারাগারে ধুঁকছে।

সূত্র–গার্ডিয়ান